ঢোঁড়াই চরিত মানস

ঢোঁড়াই চরিত মানস

সতীনাথ ভাদুড়ী

ঢোঁড়াই চরিত মানস
সতীনাথ ভাদুড়ী

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৫০০ টাকা

Dhorai Charita Manas by Satinath Bhaduri Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 Kobi First Edition: February 2021 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 Phone: 02-9668736
Price: 500 Taka RS: 500 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94933-1-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী’র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

ঢোঁড়াই চরিত মানস

প্রথম চরণ

আদিকাণ্ড

জিরানিয়ার বিবরণ

অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিরানিয়া। রামচরিতমানসে[১] এর নাম লেখা আছে 'জীর্ণারণ্য'। পড়তে না পারো তো মিসিরজীকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। তখনও যা ছিল, এখনও প্রায় তাই। বালিয়াড়ি জমির উপর ছেঁড়া ছেঁড়া কুলের জঙ্গল। রেলগাড়ি ইস্টিশানে পৌঁছবার আগেই ঘুমন্ত যাত্রীদের ঠেলে তুলে দিয়ে লোকে বলে 'জঙ্গল আ গেয়া, জিরানিয়া আ গেয়া' (জঙ্গল এসে গিয়েছে, জিরানিয়া এসে গিয়েছে)।

তাৎমাটুলির লোকেরা একেই বলে 'টৌন' (টাউন)। যেমন-তেমন হেঁজিপেঁজি শহর নয়–'ভারী সাহার',[২] পীরগঞ্জ থেকেও বড়, বিসারিয়া থেকেও বড়। পীরগঞ্জে কলস্টর (কালেক্টর) সাহেবের কাছারি আছে? বিসারিয়ায় ধরমশালা আছে? পাদ্রী সাহেবের গীর্জা আছে? ভা-আ-রী সাহার জিরানিয়া। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাস্তা দিয়ে টমটম যায়; পাকা রাস্তা দিয়ে। দোতলা বাড়িও আছে, পাকা দোতলা। চেরমেন (চেয়ারম্যান) সাহেবের।

শহরের 'বাবুভাইয়ারা' সব ছিলেন 'বাং-গালী'; 'ওকিল, মুখতার, ডকটার, আমলা' সব। তাঁদের ছেলেপিলেদেরও এ শহরের গর্ব ছিল তাৎমাদেরই মতো। না হলে সেকালের যুগে কালীবাড়ি কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট পড়ার সময় বিরাটবপু রায়সাহেব জিরানিয়াকে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, 'এটা একটা সামান্য পণ্ডগ্রাম'। ছেলের দল চিৎকার করে তাঁকে আর 'গণ্ডশ্রম' না করে বসে পড়তে বসে। তাদের নাগরিক গর্বে আঘাত লেগেছিল।

তাৎমাটুলির কাহিনী

এ হেন শহরের শহরতলি, তাৎমাটুলি; শহর যখন, তার শহরতলি থাকবে না কেন? জিরানিয়া আর তাৎমাটুলির মধ্যে আর কোনো গাঁ নেই। সেই জন্য

---

১ তুলসীদাসজীর লেখা রামায়ণের নাম 'রামচরিতমানস'। ভারতবর্ষের মধ্যে রামচরিতমানসই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় বই। রামচরিত্র মানসসরোবরের ন্যায় বিশাল। এর ভিতর রামকথারূপ হাঁস ঘুরে বেড়ায়।

২ প্রকাণ্ড শহর।

তাৎমাটুলিকে বলছি শহরতলি। শহর থেকে মাইল চারেক দূরে হবে; তাৎমারা বলে 'কোশভর'[১]। তাৎমাটুলির পশ্চিমে শিমুলগাছ-ভরা বকরহাট্টার মাঠ, তারপর ধাঙড়টুলি। দক্ষিণ ঘেঁষে গিয়েছে মজা নদী 'কারীকোশী'—লোকে বলে 'মরণাধার'। মাঠের বুক চিরে গিয়েছে কোশী শিলিগুড়ি রোড। তাৎমাটুলির লোকেরা এই রাস্তাকে বলে 'পাক্কী'[২]।

বোধ হয় তাৎমারা জাতে তাঁতি। তারা যখন প্রথম আসে, তখন খালি একজনের কাছে ছিল একটা ভাঙাচোরা গোছের গামছা বোনার তাঁত। দ্বারভাঙ্গা জেলার রোশরা গ্রামের কাছ থেকে অনেকদিন আগে এখানে এসেছিল দল বেঁধে–পেটের ধান্ধায়। না এদের কেউ কোনোদিন কাপড় বুনতে দেখেছে, না এরা স্বীকার করত যে, এর তাঁতি। এরা চাষাবাস করে না, বাসের জমি ছাড়া জমি চায় না। আর বাড়িতে একবেলার খাওয়ার সংস্থান থাকলে কাজে বেরোয় না। সেটুকুও বোধ হয় জুটছিল না দ্বারভাঙ্গা জেলায়। তাই এসে তারা 'ধন্না' দিয়েছিল ফুকন মণ্ডলের কাছে। তিনি তখনকার একজন বড় 'কিসান'[৩] (জোতদার)। তাঁর আবার জমিদার হওয়ার ভারি শখ। নামমাত্র খাজনায় একরকম জোর করে তিনি এদের এই জমিতে রেখেছিলেন। নিজেই এদের বাড়ি করবার জন্য বাঁশ খড় দিয়েছিলেন। চিঠির কাগজে মনোগ্রাম ছাপিয়েছিলেন—বকরহাট্টা এস্টেট, দেউকি ফুকননগর। তাঁর দেওয়া ফুকননগর নাম ধোপে টেঁকেনি। নাম হয়ে গেল তাৎমাটুলি। যতদিন বেঁচেছিলেন, তিনি রোজ এখানে আসতেন। তাঁর পাড়ার বখা ছেলেরা তাঁর আসার পথ ছেড়ে দিত—'সরে যা, সরে যা—জমিদার সাহেব ক্যাম্প ট্যাটমাঠোলিতে যাচ্ছেন, নিমাস্তিনের পকেটে এস্টেটের কাছারি নিয়ে।' মোটা লেন্সের চশমার মধ্যে দিয়ে তিনি রোজ ধাঙড়টোলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন।—সবুজ বাঁশবনের পিছনে পরিষ্কার করে নিকানো ধাঙড়দের খড়ের ঘরগুলো, এখানে থেকেই যেন দেখতে পেতেন। অঙ্গনে, মেঠোপথে, আমগাছের তলায় খড়ের কুটোটি পর্যন্ত নেই। সব ঝকঝকে তকতকে। লোকেরা চকচকে কালো, সুন্দর স্বাস্থ্য। সেখানকার ছাগল, কুকুর, গাছ ল্যাংটো শিশু, সবই যেন তাজা নধর। এতদূর থেকেও যেন দেখা যায়, তাদের কাপড় চোপড়, বাঁদরার[৪]ছাইয়ের ক্ষার দিয়ে পরিষ্কার ধবধবে করে কাচা। মাদলের শব্দ যেন কানে আসছে পিড়িং পিড়িং।...

---

১ মাত্র এক ক্রোশ।

২ পাকা রাস্তা।

৩ জিরানিয়া জেলায় 'কিসান' বলতে ঠিক যারা নিজেরা জমি চাষ করে তাদের বোঝায় না। দশ পনের হাজার বিঘা জমি যার সেও কিসান। কেবল গভর্ণমেন্টে রেভেনিউ দিলেই তবে তাকে বলে জমিদার।

৪ একরকম পরগাছা।

বকরহাট্টা এস্টেটের জমিদারবাবু ভাবেন কেন তাঁর প্রজা তাৎমারা এরকম হল না, কেন তারা ধাঙড়দের মতো ঠিক সময়ে খাজনা দিয়ে দেয় না। জমিদারি থেকে রোজগার না হয় নাই হল, কিন্তু প্রজারা একটু পরিষ্কার-ঝরিষ্কার থাকলে, একটু পাড়াটা দেখতে ভাল হলে, জমিদারের ইজ্জৎ বাড়ে। বাংগালী উকিল হরগোপালবাবু কতদিনই বা জিরানিয়ায় এসেছেন। এখনও ত্রিশ বছর হয়নি। যেবার রেললাইন হল বাংগালী বাবুভাইয়ারা পিঁপড়ের মতো দলে দলে এসে শহরের এদিকে বাড়ি করলেন। ওদিকে সাহেবদের মহল্লা, সাহেবরাই রেললাইন আনিয়েছে নিজেদের পাড়ার কাছ দিয়ে। ওদিকে তো বাংগালী বাবুদের'দাল গলল না'।[১] ওঁরা এলেন এদিকে। তখন ধাঙড়রা থাকত ঐখানেই। লোক দেখলেই তারা পালায় দূরে। তাই তারা এসে বাসা বাঁধল আজকালকার ধাঙড়টোলায়। ভারি বুদ্ধিমান লোক হরগোপালবাবু; পয়সা কামাতে জানেন। কাছারির নিলামে কেনা 'পড়তী' জমি, গরুচরার জন্য লোকে নিত কিনা সন্দেহ, তাই দিলেন ধাঙড়দের মধ্যে বিলি করে। সেই জিনিসই এখন দেখ কেমন ফেঁপে ফুলে উঠেছে। ঐ কিরিস্তানে ধাঙড়গুলোর বাংগালীদের সঙ্গেই খাপ খায়। যাকগে মরুকগে! রামচন্দ্রজী! 'কৃপা তুমহারি সকল ভগবানা'[২]।

এ অনেক দিনের কথা হল।

এর পর বহুবার বকরহাট্টার মাঠ সবুজ হয়ে গেলে 'মরণাধারে' জল এসেছে, বহুবার কুল পাকার সময় শিমুল বনে ফুলের আগুন লেগেছে, লু বাতাসে শিমুল তুলো উড়ে যাওয়ার সময় 'পাক্কীর' ধারের নেড়া অশত্থ গাছগুলো তাৎমাদের আচার খাওয়ার জন্য কচি কচি ডগা ছেড়েছে। তাৎমাদের মধ্যে কেউ হিসাব জানলে বলত—এ 'ঢের সালের'[৩] কথা—দশ সাল, বিশ সাল, এককুড়ি, দোকুড়ি, তিনকুড়ি সালের কথা। মনে মনে গুনবার মিছা চেষ্টা করত—এর মধ্যে 'ঝোটাহারা'[৪] ক'বার 'স্নান করেছে'[৫]।

তাৎমাটুলিদের মাহাত্ম্য বর্ণন

তাৎমাটুলিতে ঢুকতে হবে পালতেমাদারের ডাল থেকে মাথা বাঁচিয়ে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার বাইরের দুর্গন্ধটা ঢেকে যায়—শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধে। খড়ের ঘরগুলো বাঁকা নড়বড়ে—দেশলাইয়ের বাক্স পায়ের তলায় চেপ্টে যাবার পর ফের

---

১ মুরদে কুলোল না; টু ফ্যাঁ চলবে না ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়।

২ সবই তোমার কৃপা—তুলসীদাস থেকে।

৩ অনেক বছর।

৪ ঝুঁটিওয়ালী তাৎমারা মেয়েদের এই নামেই ডাকে।

৫ তাৎমা মেয়েরা সাধারণত বছরে একবার 'ছট' পরবের সময় স্নান করত। যে মেয়েরা একটু বেশি ছিমছাম তারা স্নান করে মাসে একবার।

সোজা করবার চেষ্টা করলে যেমন হয় তেমনি দেখতে। ফরসা কাপড় পরা লোক দেখলে, এখানকার কুকুর ডাকে, কোমরে ঘুনসি বাঁধা ল্যাংটো ছেলে ভয়ে ঘরের ভিতর লুকোয়; বাঁশের মাচার উপর যে কঙ্কালসার রুগ্ন বুড়োটা ল্যাংটো হয়ে রোদ্দুরে শুয়ে থাকে, সেও উঠে বসতে চেষ্টা করে আদাব করবার জন্য। মেয়েরা কিন্তু একটু অন্য রকম। এর বাড়ির উঠোনে আর ওর বাড়ির পিছন দিয়ে তো যাওয়ার পথ। ধোঁদলের হলদে ফুলে ভরা একচালাটার নিচে যে মেয়েটা তামাক খাচ্ছে, সে না হুঁকোটা নামায়, না চিরকুট কাপড়খানা সামলে গায়ে দেবার চেষ্টা করে! ইদারাতলার ঝগড়া সেইরকমই চলতে তাকে, কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না; তেলের বোতল হাতে কুঁজো বুড়িটা ফিক করে হেসে হয়তো জিজ্ঞাসাও করে ফেলতে পারে যে বাবু কোনদিকে যাবেন।

এই হল বাইরের রূপ; কিন্তু বাইরের রূপটাই সব নয়, –

তাৎমাটোলার লোকেরা বলে—রোজা, রোজগার, রামায়ণ, এই নিয়েই লোকের জীবন। অসুখে বিসুখে বিপদে আপদে এদের দরকার রোজার। রোজাকে বলে গুণী। রোজগার এদের 'ঘরামি'র কাজ আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ। জিরানিয়ার অধিকাংশ বাড়িরই খোলার চাল, আর প্রত্যেক বাড়িতেই আছে কুয়ো। তাই কোনোরকমে চলে যায়। লেখা- পড়া জানে না, কিন্তু রামায়ণের নজির এদের পুরুষের কথায় কথায়, বিশেষ করে মোড়লদের।

মেয়েদের না জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলে—গাঁয়ে আছে কেবল 'পঞ্চায়তি', আর 'পঞ্চায়তি' আর 'পঞ্চায়তি'[১]।

ধাঙড়টুলির বৃত্তান্ত

ধাঙড়টুলির সঙ্গে তাৎমাটুলির ঝগড়া, রেষারেষি চিরকাল চলে আসছে। ধাঙড়দের পূর্ব-পুরুষরা আসলে ওরাওঁ। কবে তারা সাঁওতাল পরগণা থেকে গঙ্গার এপারে আসে কেউ জানে না। তবে সাঁওতাল পরগণার ওরাওঁদের ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার মিল আছে। ধাঙড় ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলবার সময় তারা হিন্দীতে কথা বলে।

ধাঙড়দের মধ্যে কয়েক ঘর খৃষ্টান। অধিকাংশ ধাঙড়ই সাহেবদের বাড়ি মালীর কাজ করে, যারা মালীর কাজ না পায় বা পছন্দ না করে তারা অন্য অন্য কাজকর্ম করে। কুলের ডাল কাটা থেকে আরম্ভ করে মৌচাক কাটা পর্যন্ত কোনো কাজেই তাদের আপত্তি নেই। সকলেরই গায়ে অসীম ক্ষমতা, আর কাজে ফাঁকি দেয় না বলে, সকলেই তাদের মজুর রাখতে চায়।

---

১ পঞ্চায়তের মোড়লকে বলে 'মহতো'। চারজন মাতব্বরকে এরা বলে 'নায়েব'। আর যে 'লুটিস' তামিল করে, আর লোকজনকে ডেকেডুকে নিয়ে আসে তার নামি 'ছড়িদার'। মহতো আর চারজন নায়েব পঞ্চায়েতে থাকে পাঁচজন, 'পঞ্চ'।

ধাঙড়রা তাৎমাদের বলে নোংরা জানোয়ার। তাৎমারা ধাঙড়দের বলে 'বুড়বক কিরিস্তান' (বোকা খৃষ্টান)।

ধাঙড়টুলি পরগণা ধরমপুরে, আর তাৎমাটুলি হাভেলী[১] পরগণাতে। রাজা তোডরমল্লের যুগে যখন এই দুই পরগণার সৃষ্টি হয়, তখনও পরগণা দুইটির মধ্যের সীমারেখা ছিল একটি উঁচু রাস্তা। সেইটাকেই এযুগে পাকা করে নাম হয়েছে কোশী-শিলিগুড়ি রোড। কিন্তু এখন ঐ রাস্তা কেবল ধরমপুর আর হাভেলী পরগণার সীমারেখা মাত্র নয়, তাৎমা ও ধাঙড় এই দুটি সম্প্রদায়ের হৃদয়েরও বিচ্ছেদরেখা।

ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তাৎমা আর ধাঙড়দের মধ্যে নিত্য ঝগড়া লেগেই আছে। গায়ে পড়ে ঝগড়া আরম্ভ করে তাৎমারাই। ঝগড়াটা বেশ বেধে যাওয়ার পর পালানোর পথ পায় না। তবু অভ্যাস যাবে কোথায়।

বৌকা বাওয়ার আদিকথা

তাৎমাটুলির বড় রাস্তার ধারে আছে একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ। তার নিচে একটি উঁচু মাটির ঢিবি বেশ করে সিঁদুর মাখানো। ইনি হচ্ছেন তাৎমাদের 'গোঁসাই'[২]। এই গোঁসাইয়ের সম্মুখে পোঁতা আছে একটা প্রকাণ্ড হাড়িকাঠ। এই জায়গাটার নাম গোঁসাইথান; লোকে ছোট করে বলে 'থান'। প্রতি বছর ভাইদ্বিতীয়া না তার পরের দিন এই হাড়িকাঠে তেল- সিঁদুর পড়ে, একটা নিশান পোঁতা হয়, আর চাঁদা করে কেনা একটা ভেড়া বলি দেওয়া হয়।

এই 'থানে'ই 'বৌকা বাওয়ার'[৩] আস্তানা। বৌকা বাওয়ার আগে কিংবা পরে তাৎমাদের মধ্যে আর কেউ সাধু সন্ন্যাসী হয়নি।

ছোটবেলায় বৌকা তার মার সঙ্গে ভিক্ষে করতে বেরুত। শহরের গেরস্তদের দোরগোড়ায় 'খোখা-আ নানু-উ উউ'[৪] এই ডাকে শুনলেই বাড়ির লোকে বলত, 'এইরে বৌকামাই[৫] এসেছে, এখন দুটি ঘণ্টা চলবে একটানা চিৎকার।' দিদিরা ছোট ভাইকে ভয় দেখাত—কাঁদলেই দেব বৌকামাইয়ের কাছে ধরিয়ে।

সেই বৌকা বড় হয়ে তার দাড়ি-গোঁফ গজালে, হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, একটা চিমটে আর একটা ছোট ত্রিশূল নিয়ে সেই গোঁসাইথানে বসে আছে। পাড়ার লোকে দেখতে এলে, বৌকা ত্রিশূলটা ইট দিয়ে ঠুকে মাটিতে গেঁথে দিল।

---

১ অন্দরমহল।

২ তাৎমা সূর্যদেবকেও 'গোঁসাই'বলে; আবার ঐ অশত্থতলায় সিঁদুর মাখানো যিনি আছেন তাঁকেও গোঁসাই বলে।

৩ বোবা সন্ন্যাসী।

৪ খোকা ছোট ছেলে।

৫ বৌকার মা; কারও নামের সঙ্গে মাই শব্দটি যোগ করলে অর্থ হয় অমুকের মা।

সেই দিন থেকে ঐ 'থানে'ই তার আস্তানা। এদিনকার বৌকা ঐদিন থেকেই বৌকা বাওয়া হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরের কথা। গোঁসাইথানের পাশেই পথের ধারে একটা ঝড়ে-পড়া পাকুড়গাছ বহুদিন থেকে পড়ে ছিল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের জিনিস; কিন্তু তাৎমারা নিয়মিত শুকনো গাছটার থেকে জ্বালানি কাঠ কেটে নিচ্ছিল। শিকড়ের মোটা কাঠগুলিকে পর্যন্ত তারা গর্ত করে বের করে নিতে ছাড়েনি। পড়ে ছিল কেবল মোটা গুঁড়িটা। এই কাত হয়ে পড়া গুঁড়িটা একদিন সকালে খাড়া দাঁড় করানো অবস্থায় দেখা যায়। আরও দেখা যায় যে, বৌকা বাওয়া হাত জোড় করে গাছের চারিদিকে ঘুরছে আর প্রত্যেক পরিক্রমার পর একবার করে সূর্যদেবকে প্রণাম করছে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। রেবণগুণী বলে, জিনের কাণ্ড। চশমা-পরা সর্বজ্ঞ পেশকার সাহেব রায় দিলেন—'ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পথের ধারে ডাল পুঁতে গাছ লাগায়। সেই জন্য এসব গাছের ট্যাপরুট নেই—তা না হলে কি এরকম হয়।' বিজনবাবু উকিলের কলেজে-পড়া ছেলে ফরিদপুরের সূর্যোপাসক খেজুরগাছের কথা তোলে। স্কুলের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে, —'নস্তুদা পণ্ডিত হবে না?ও যে কলেজে 'ভুটানি'[১] পড়ে'। এসব ব্যাখ্যা তাৎমা ধাঙড়দের মনে ধরেনি। এই দিন থেকে বৌকা বাওয়ার প্রসার-প্রতিপত্তি অনেকগুণ বেড়ে যায়। তার নামডাক তাৎমাটোলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। গোঁসাইথানের বেদীর উপরের তেল-সিঁদুরের প্রলেপ আরও পুরু হয়ে উঠতে থাকে। বাওয়ার আস্তানার জন্য লোকে নিজে থেকে খড় বাঁশ দড়ি পৌঁছে দেয়।

তাৎমাদের বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ টাকা পায় বরপক্ষের কাছ থেকে। তাৎমাটুলির বুড়িরা বলে 'আহা টাকা অভাবে বিয়ে করতে না পেরে বৌকাটা সন্ন্যাসী হয়ে গেল।'

তাৎমাদের ছেলেরা বিয়ে হলেই সাহেবদের মতো মা-বাপের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই ভয়ে বৌকার মা ভিক্ষায় জমানো আধলাগুলো একদিনও ছেলের হাতে দেয়নি।

বৌকামাই মারা যাওয়ার দিন বৌকা যখন নারকেলের মালায় করে তার মুখে জল দিচ্ছিল, তখন সে ছেলের হাতটা বুকে টেনে নিয়ে বলেছিল—'অযোধ্যাজীতে গিয়ে থাকিস–সেখানে খুব ভিক্ষে পাওয়া যায়। পীপড় (অশথ) গাছ কোনোদিন কাটিস না। ধাঙড়টোলার 'কর্মাধর্মার'[২] নাচ দেখতে যাস না, ওদের মেয়েরা বড় খারাপ। অদৌড়ি[৩] খেতে বড় ইচ্ছে করছে। নারকেলের মালা যেখানেই দেখবি তুলে নিস ও এটো হয় না।

---

১ Botany।

২ ধাঙড়দের ভাদ্রপূর্ণিমার দিনের উৎসব আর পূজা।

৩ আদা দেওয়া একরকম বড়ি।

—এর পরের কথাগুলো বৌকা মায়ের মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়েও বুঝতে পারেনি। কেবল শুকনো ঠোঁট দুখান নড়তে দেখেছিল। মায়ের আধাবোঁজা চোখের কোণ থেকে যে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল, সেটাকে মুছিয়ে দিয়েছিল লেঙটের খুঁট খুলে নিয়ে। ঠোঁটের কোণের ছোট্ট লাল পিঁপড়েটাকে দু আঙুল দিয়ে খুঁটে তুলে দূরে ফেলে দিয়েছিল—মেরে ফেলতে মন সরেনি।

বাল্যকাণ্ড

ঢোঁড়াইয়ের জন্ম

বুধনীর মনে আছে যে, ঢোঁড়াই যেদিন পাঁচদিনের সেদিন 'টৌনে'[১] ছিল একটা 'ভারী তামাসা'। আর একদিন আগেই যদি ঢোঁড়াই জন্মায়, তাহলেই বুধনী ছদিনের দিন স্নান করে তামাসা দেখতে যেতে পারে; কিন্তু তা ওর বরাতে থাকবে কেন! কেবল খাও, রসুন গুড় আদাবাঁটা একসঙ্গে সেদ্ধ করে সেইটা তেলে ভেজে! মরগা! বুধনী কাঁদতে বসে।

ওর স্বামীটা ভারি ভালামানুষ। অন্য তাৎমারা বলে হাবাগোবা তাই রোজগার কম। বুধনীর নিজের রোজগার আছে বলেই, চলে যায় কোনোরকমে। তার স্বামীকে তাৎমার দল চাল ছাইবার সময় খাপরা বওয়ায়, খাপরার ঝুড়ি নিয়ে মইয়ে চড়ায়; মাঘে কুয়ো পরিষ্কার করতে হলে, তাকেই জলের ভিতর বেশিক্ষণ কাজ করায়।

বুধনীকে কাঁদতে দেখে 'তা এখন কাঁদতে বসলি কেন? ছেলেটার দিকেও দ্যাখ—ঘাড় কাত করে রয়েছে কেন। তোর জন্যে আবার দুপয়সার মসুরির ডাল কিনে আনলে হবে। কি গরম মসুর ডাল—না?'

তার স্বামী কোনোদিন মসুর ডাল খায়নি! সে কেন, কোনো তাৎমাই খায় না। গরম জিনিস খেলে গায়ে কুষ্ঠ হয়ে যাবে সেই ভয়ে। খালি খাবে মেয়েরা, ছেলেপিলে হওয়ার পর কয়েকদিন, তখনি ওদের শরীরের রস শুকোনোর দরকার সেইজন্যে।

বুধনী বলে, 'হ্যাঁ, খেলেই যে গরম আগুন জ্বলে গায়ে।'

'আমি তামাসা দেখে এসে তোকে সব বলব, বুঝলি? কাঁদিস না।'

সেদিন 'টৌন' থেকে বাড়ি ফিরবার সময় ঢোঁড়াইয়ের বাপের বুক দুর দুর করে ভয়ে। দুটো পয়সা ছিল তার কাছে। তামাসায় গিয়ে সে তাই দিয়ে এক পয়সার এক 'পা বাত্তিমার'[২] কিনেছে, আর এক পয়সার খয়নি। বাড়ি গিয়ে এখন কি বলবে বুধনীর কাছে মসুর ডালের সম্বন্ধে, সেই কথাই সে ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফেরে; যত বোকা তাকে সকলে ভাবে সে তত বোকা নয়।

---

১ জিরানিয়া।

২ এক প্যাকেট লণ্ঠন মার্কা সিগাটের; সিগারেটটির নাম ছিল রেড ল্যাম্প।

'কে আর দোকান খোলা রাখবে, ঐ রাজার দরবারের[1] 'জুলুস'(মিছিল) দেখা ছেড়ে দিয়ে।' এই কথা বলতে বলতে সে বাড়ি ঢোকে।

বুধনী অনেকক্ষণ থেকে তারই জন্য অপেক্ষা করছিল, তামাসার খবর শোনবার জন্য।

'কার? কপিল রাজার নাকি?'

কফিল রেজা কুলের জঙ্গলের ঠিকেদার, লা-র ব্যবসা করে। তাকেই সকলে বলে কপিল রাজা।

'না রে না ওলায়তের (বিলাতের) রাজার। তার কাছে কলস্টর সাহেব, দারোগা পর্যন্ত 'থর থর থর থর'[2]।

দরবার কথাটার ঠিক মানে, ঢোঁড়াইয়ের বাপ নিজেই বুঝতে পারেনি। মনে মনে আন্দাজ করেছে যে বোধ হয় এই মিছিলেরই নাম দরবার। পাছে বুধনী ঐ কথাটার মানে জিজ্ঞাসা করে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি সে 'জুলুসে'র হাতি ঘোড়া উটের কথা বলতে আরম্ভ করে।

সে কী বড় বড় হাতি! সোনার কুর্তা পরানো, ইয়াঃ বড় বড় দাঁত, চাঁদি দিয়ে ঢাকা সে যে কত চাঁদি, তা দিয়ে যে কত ঘুনসি হতে পারে, তার ঠিকানা নেই। একটা হাতি ছিল, সেটার আবার একটা দাঁত ছোট্ট কদুর মতো। উটগুলো চলেছে টিম-টাম টিম-টাম, সামনে পিছনে—ঠিক খোঁড়া চথুরীটার মতো চলার ধরণ। হাতির পিঠে চাঁদির হাওদায় 'কলস্টর সাহাব' (কালেক্টর সাহেব), আর একটায় বুধনগরের কুমাররা, আরও কত সাহেব, কত হাকিম কে কে, সব কি অত চিনি ছাই! সাদা ঘোড়ার ফিঠে ভাইচেরমেন সাহাব। কী তেজী ঘোড়া! টকস-টকস টকস-টকস কি চাল ঘোড়ার! তার কাছে যায় কার সাধ্যি। ছত্তিসবাবুর[3] দোকানের বারান্দায় বাঙালী মাইজীদের মিছিল দেখার জন্য চিক টাঙিয়ে দিয়েছিল—ঘোড়াটা তার চার পা তুলে দিতে চায় সেই চিকের উপর। ইয়াঃ তালের মতো বড় বড় খুর!

বুধনী আঁতকে ওঠে ভয়ে 'গে মাইয়া! তাই নাকি।'

আরও কত তামাসার খবর বুধনী শোনে। তার দুঃখের সীমা নেই। উট আর কলস্টর সাহাব দেখা তার পোড়া কপালে রামজী দেন নাই, সে আর কার দোষ দেবে।....

ছেলেটা কেঁদে ওঠে।

ঢোঁড়াইয়ের বাপ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।—'নে, নে দুধ দে। অমন করে তুলিস না—ঘাড় মটকে যাবে 'বিলি বাচ্চাটার'[4]। তারপর ঐ 'বিলি বাচ্চা' ঢোঁড়াইয়ের দিকে মাথা নেড়ে, হাততালি দেয়।

---

১ দিল্লী দরবার (১৯১২)।

২ তাৎমারা কথা বলবার সময় ধ্বনি প্রধান শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করে।

৩ সতীশবাবু।

৪ বিড়ালের বাচ্চাটার (আদরে)।

এ নুনু! (ও খোকন) এত্তা ভাত খাওগে? (এতগুলো ভাত খাবে) বকড়ি চরাওগে? (ছাগল চরাবে)।

এত্তা ভাত খাওগে, বকড়ি চরাওগে। এত্তা ভাত খাওগে, বকড়ি চরাওগে।

ছেলেকে দুধ দিতে দিতে গর্বে বুধনীর বুক ভরে ওঠে। ছেলেপাগল লোকটার আদর করা দেখে হাসি আসে। তোমরা বিলি বাচ্চা কি এখন শুনতে শিখেছে, এখনও আলোর দিকে তাকায় না, ওকে হাততালি দিয়ে দিয়ে আদর হচ্ছে! পাগল নাকি!

ঢোঁড়াইয়ের বাপ বেঁচে গিয়েছে আজ খুব; 'তামাসা'র গল্প আর ছেলে সামলানোর তালে মসুর ডাল না আনার কথা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু তার মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে— ছেলের তাকৎ মায়ের দুধে, আর মায়ের দুধ হয় মসুর ডালে।

খানিক পরেই মহতোগিন্নী আসেন প্রসূতির তদারক করতে। হাজার হোক ছেলেমানুষ তো বুধনী। মা হলে কি হয়, পেট থেকে পড়েই কি লোকে আঁতুরঘরের বিধিবিধান শিখে যাবে। কালস্নান করার দিন। মহতোগিন্নী না দেখাশুনো করলে, পাড়ার আর কার গরজ পড়েছে বলো। মহতোগিন্নী হওয়ার ঝক্কি তো কম নয়। এসেই প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন বুধনীকে, মসুর ডালে রসুন ফোড়ন দিয়েছিলেন না আদা ফোড়ন? দোকান বন্ধ ছিল। কে বলল? তোমার 'পুরুখ'[১]? আমি নিজের চোখে দেখে এলাম খোলা রয়েছে দেখে আসা কেন, আমি নুন কিনে এসেছি।..

তারপর চলে মহতোগিন্নীর গালাগালি ঢোঁড়াইয়ের বাপকে। বুধনীও সঙ্গে সঙ্গে রসান দেয়। পাড়ার অন্য কোনো বয়স্থ পুরুষকে এরকম ভাবে বকতে মহতোগিন্নী নিশ্চয়ই পারতেন না। কিন্তু এ মানুষটিকে সবাই বকতে পারে।

তারপর মহতোগিন্নী চলে গেলে ঐ 'পুরুখ' বুধনীর কাছে সব কথা খুলে বলে, নিজের দোষ স্বীকার করে।

বুধনী মনে মনে হাসে। এমন 'পুরুখে'র উপর কি রাগ করে থাকা যায়। লোকের ঠাট্টাটা পর্যন্ত বোঝে না এ মানুষ; না হলে কাল হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে আমাকে খবর দেওয়া হল যে, রতিয়া 'ছড়িদার' রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করেছে ওকে যে- ছেলের রঙ মকসূদনবাবুর গায়ের রঙের মতো হয়েছে নাকি।

বুধনীর বৈধব্য ও পুনর্বিবাহ

ঢোঁড়াই হয়েছিল বেশ মোটাসোটা। রংটাও কালো না—মাজা মাজা গোছের—তাৎমারা বলে গরমের রং। তার বাপ সন্ধ্যার সময় কাজ থেকে এসেই

---

১ স্বামী।